মুসলিম নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

আলী আকবর

প্রকাশক
সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ
ঢাকা

প্রথম সংস্করণ জুলাই, ১৯৭০

মূল্য ঃ ত্রিশ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর
লুৎফর রহমান
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড,

www.pathagar.com

মুসলিম নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলিম নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

'সাহিত্য মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি'। মানুষের হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা, আচার-ব্যবহারের মূর্ত প্রকাশ সাহিত্যের মাধ্যম। সমাজের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম প্রভৃতির প্রকাশও সাহিত্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মানব হৃদয়ের বেদনার্ত ও সংগ্রাম-মুখর জীবনের সঠিক ও নির্ভুল চিত্র সাহিত্যিকগণ তুলে ধরেন। সংবেদনশীলতায় কাতর হয়ে সাহিত্যিক যে সাহিত্য রচনা করেন, সেটাই হল সার্বজনীন সাহিত্য। স্থান-কাল-পাত্র ভেদ করে সে সাহিত্য কালজয়ী হয়ে সমাজের বুকে অবস্থান করে। দর দীমন, সুগভীর অনুভূতি, জীবন জিজ্ঞাসা, রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়, সে সাহিত্য চিরন্তন সাহিত্য।

সাহিত্য সর্বকালের সর্ব মানুষের কল্যাণের জন্যে রচিত হয়ে থাকে। সৎ সাহিত্য কোন বিশেষ কাল বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যে রচিত হয় না। সাহিত্যের আবেদন যদি কোন বিশেষ কাল বা জাতির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে সে সাহিত্যকে কোন, অবস্থাতেই সৎসাহিত্য বলা চলে না। সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন, সাহিত্য কালজয়ী। প্রতিটি সৎ সাহিত্যে মানব হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বাস্তব জীবনের এক একটি নিখুঁত ছবি কালজয়ী হয়ে সমাজের বুকে রয়ে যায়। সাহিত্য অমর, অক্ষয়। তাই অম্লান জ্যোতিতে সাহিত্য চিরদিন সমাজকে আলো বিকিরণ করে যায়।

www.pathagar.com

'সাহিত্য' কথাটি ব্যাপক। সাহিত্য বলতে অনেক কিছু বুঝায়। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, রম্যরচনা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের এক-একটি অঙ্গ। গল্প, কবিতার মতো নাটকও সমাজের চিত্র দর্শকের সম্মুখে তুলে ধরে। মানব জীবনের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা ভাবনা ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই নাট্যকার দশকদের সম্মুখে তুলে ধরেন। মানুষের অনুভূতি, হৃদয়াবেগ, সমাজ-জীবনের জটিলতা ও তীক্ষ্ণতা নাটকের বিষয়বস্তু।

নাটক দৃশ্য-কাব্য। এখানে নাট্যকারকে দর্শকের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়। কল্পনার জাল বুনে কথার ফানুস উড়িয়ে দিলে দর্শকগণ খুশী হন না। সমাজের এক-একটি ছবি মঞ্চের উপর ভেসে উঠবে। দর্শক তার সূক্ষ্ম মাপকাঠি দিয়ে তা বিচার করবে। অতএব এখানে সস্তা আবেগ ও হালকা অনুভূতির কোন মূল্য নেই। নাটক বিচার হবে দর্শকদের সমালোচনার উপরে। নাট্যকার যেমন দর্শকের মুখোমুখী-দাঁড়িয়ে থাকেন, নাটককেও তাই সমাজের রূঢ় বাস্তবতার সাঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকতে হয়। নাটককে কোন অবস্থাতেই জীবনের সাথে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। কবিতা বা গল্প হৃদয়াবেগ, জীবনানুভূতির মাধুর্য মিশিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভব। কিন্তু নাটকের বেলায় তা আদৌ সম্ভব নয়। নাট্যকারকে প্রত্যক্ষ ও নিবিড়-ভাবে বাস্তব জীবনবোধের সাথে জড়িত থাকতে হয়। কবি ও ঔপন্যাসিককে নাট্যকারের মতো এতো নিবিড়ভাবে সমাজের সম্মুখীন হতে হয় না। এখানেই নাট্যকার আর কবি– ঔপন্যাসিকের মধ্যে পার্থক্য।

রাতদিন শুধু কাজ করে মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজের ফাঁকে

www.pathagar.com

ফাঁকে একটু আনন্দ, ফূর্তি, এক অলস অবসর চাই। এই আনন্দ-ফূর্তি মানুষ নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করে থাকে। আচার-অনুষ্ঠানেরও একটি রূপ আছে। নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে, সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে সমাজে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আনা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে পালাগান, যাত্রা, কবিগানের আয়োজন করে মানুষ আমোদ-ফূর্তির ব্যবস্থা করত। এইসব অনুষ্ঠানের জন্যে কোন প্রকার ব্যয় ছিল না—কোন প্রকার আড়ম্বরের প্রয়োজন হত না। খোলা মাঠে উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে এই সব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হত। খোলা মাঠে আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানে দু' কবি মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গান গাইত। সব গান তারা উপস্থিত মতো রচনা করে গাইত। আর হাজার হাজার দর্শক অভিভূত হয়ে স্থানুর মতো বসে থাকত। কবিগানের পর পালাগান, যাত্রাগান আসে। এসব অনুষ্ঠানগুলিও অনুরূপভাবে চলত—কোন ব্যতিক্রম বা বৈচিত্র ছিল না এতে। তখন ইংরেজ আগমন ঘটেনি। এদেশের সংস্কৃতি রূপ রেখাই এইরূপ ছিল। কালের বিবর্তন ও পরিবর্তনে কত কিছু হয়ে গেল। আজ আমরা আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবই ভুলতে বসেছি। আর ভিন্ন দেশীয় কৃষ্টি-সভ্যতাকে আকড়ে ধরে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ হারাতে বসেছি। যাহোক, তখন ইংরেজ আগমন এদেশে ঘটেনি, ফলে মঞ্চসজ্জারও ব্যবস্থা হয়নি। যাত্রার নটনটীরা একস্থানে দাঁড়িয়ে সংলাপ উচ্চারণ করে যেত। সংলাপগুলি দীর্ঘ ও আবেগময় ছিল। বাস্তব জীবনের সাথে সে-সব যাত্রার কোন সম্পর্ক ছিল না। আধুনিক নাটক আর সেকালের যাত্রার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। যাত্রা থেকে নাটকের সৃষ্টি হয়নি। যাত্রায় সুবিন্যস্ত কাহিনী ছিল

www.pathagar.com

না, সংলাপেরও কোন রীতি-নীতি ছিল না। সেহেতু আধুনিক নাটককে যাত্রার পূর্বসুরী বলতে ভুল করা হবে। আধুনিক নাটক নিতান্তই পাশ্চাত্য সভ্যতার দান।

ঐতিহাসিকদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নেপালে কিছু বাংলা নাটক রচিত হয়েছিল। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণরা বোধহয় কার্যোপলক্ষে নেপাল গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা কয়েকখানা বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন বলে কিছু প্রমান পাওয়া গিয়েছে। তবে সে নাটকগুলি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। আর আধুনিক নাটকের সাথে তার কোথাও কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দী আর মৈথেলী শব্দের আধিক্য এত বেশি ছিল যে, আজ আর তাকে বাংলা ভাষা বলে চিহ্নিত করা রীতিমতো মুশকিল হয়ে পড়ে।

আধুনিক নাটক এবং মঞ্চ সমস্তই ইংরেজদের দান। নাটক ও মঞ্চ ইংরেজদের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। নাটকের বর্তমান অঙ্গসজ্জা, এবং মঞ্চের এ বর্তমান রূপ সবই ইংরেজরা এদেশে দান করেছে। বাংলা নাটকের বর্তমান যে রূপটা দৃষ্টিগোচর হয়, আসলে সেটা এদেশীয় নয়। এমনকি, ভারতীয় রূপও নয়। বাংলা সাহিত্যের নাটকে ইংরেজদের প্রভাব সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের চাইতে অনেক বেশি। অবশ্যি তার উপযুক্ত কারণও রয়েছে। ইংরেজদের নাট্যাভিনয় দেখেই বাঙ্গালীরা নাটক অভিনয়ে মনোনিবেশ করে। তখন কোন বাংলা নাটক এদেশে ছিল না। ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করে তাই অভিনয় করা হত। যেহেতু ইংরেজী নাটক, অতএব অনুরূপ ভাবে মঞ্চ তৈরী করতে হত। এর বহু আগে ইংরেজরা নাটক অভিনয়ের জন্যে তার উপযোগী মঞ্চ তৈরী করে নিয়েছিল। ইংরেজী

www.pathagar.com

অনুবাদ নাটক অভিনয় করতে একই ধরনে মঞ্চের প্রয়োজন হত। বাংলা দেশে নাটক ও মঞ্চ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের দান। যখন অনুবাদ করার জন্যে আর নাটক পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে, তখন বাঙ্গালীরা নাটক রচনা শুরু করে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের প্রচলনও ছিল। বহু হিন্দু পণ্ডিত সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে এদেশে চালাতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের সে চেষ্টা সার্থকতা লাভ করেনি। এদেশবাসী সংস্কৃত নাটক গ্রহণ করেনি। কারণ ইংরেজী নাটক ও মঞ্চসজ্জা বেশি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল। ফলে পুরাণ রীতি মাফিক নাটক এদেশে আর প্রচলিত হতে পারেনি। বহু হিন্দু সংস্কৃত জানা পণ্ডিত এদেশে সংস্কৃত নাটক চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজরা ইংরেজী নাটক অভিনয় করার জন্যেই তার উপযোগী করে মঞ্চ তৈরী করে। ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে এখানে তাদের অনেকদিন অবস্থান করতে হত। তাই এদেশ দখল করার আগেই তারা কলকাতায় নাট্যমঞ্চ স্থাপন করে। ১৭৫৩ সালে প্রথম তারা রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে নাটক অভিনয়ের জন্যে। আর বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্যে তার উপযোগী করে ১৭৯৩ সালে প্রথম রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

হিরোসিম লেবেডফ নামে জনৈক রাশিয়ান ভদ্রলোক প্রথম কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঙ্গালয়ের নাম ছিল 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। নাটক আর রঙ্গমঞ্চের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। রঙ্গমঞ্চ না থাকলে নাটক অভিনয়ও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ফলে কলকাতায় বাংলা নাটকের জন্যে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে

www.pathagar.com

নাটক অভিনয়ের সুযোগ এসে যায়। লেবেডফ লোকনাথ দাসের দ্বারা দু'টি ইংরেজী নাটক অনুবাদ করে তা মঞ্চস্থ করেন। লেবেডফ দেশী আচার-ব্যবহার ও মানুষের মেজাজের সাথে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি নাটকের সাথে বিদ্যাসুন্দর থেকে গান সংযোগ করে দেন। সেই অনূদিত নাটকেও কয়েকটি দেশীয় টাইপ চরিত্রও যোগ করে দেন, যার ফলে নাটক দু'টি দর্শকের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সূচনা। এর পর ধীরে ধীরে কলকাতায় আরো রঙ্গ-মঞ্চ গড়ে উঠে। তার মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতি প্রধান।

এদেশে সবপ্রথম মৌলিক নাটক রচনা করেন সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি ১৮৫৭ সালে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' রচনা করেন। ঐতিহাসিকগণ এখান থেকেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের সূচনা বলে মনে করেন।

মুসলিম সাহিত্যিকদের হাতে নাট্য সাহিত্য সে রকম উন্নতি লাভ করেনি। কারণ পূর্বেই বলেছি—নাটক আর নাট্যালয় পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত। রঙ্গমঞ্চ না হলে নাটক অভিনয় সম্ভব নয়। সেকালে মুসলমানগণ রঙ্গমঞ্চ তৈরীর ব্যাপারে আদৌ চেষ্টা চালাননি। তার জন্যে সামাজিক কারণও বিদ্যামান ছিল। যাহোক মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় নাট্য সাহিত্যে মুসলমানগণ পিছিয়ে পড়েছিলেন। মুসলিম বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে-সব সাহিত্যিক উন্নত ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন, তার হাতে থেকে একেবারে অপক্ক নাটক, বের হয়েছে। এর মূলে কারণ ঐ সামাজিক ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

প্রাচীন মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে গোলাম হোসেনের নাম পাওয়া যায়। গোলাম হোসেন' হাড়জ্বালানী' নামে একখানা নাটক ১৮৬৪ সালে প্রকাশ করেন। হাড়জ্বালানীকে একখানা পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা চলেনা। হাড়জ্বালানীর আঙ্গিক, সংলাপ, পরিস্ফুটন, কোন দিকেই স্বার্থক হয়নি। তবে এতে কতকগুলি সামাজিক চিত্র রয়েছে। কেরি মুন্সীর কথোপকথনের অনুকরণ হাড়জ্বালানীতে লক্ষণীয়। তবে কথোপকথনে ভাষার যে গাঁথুনী হয়েছে তা হাড়জ্বালীতে অদৃশ্য।

তদানিন্তন সমাজের একটি বাস্তব চিত্র এতে হুবহু একে দেয়া হয়েছে। বধূ বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাথে যে কেমন ব্যবহার করে, তার একটি বাস্তব ছবি এখানে রয়েছে। বইটির কথোপকথন গদ্যে রচনা, আর অন্যান্য সব যেমন—মন্তব্য, উক্তি প্রভৃতি পদ্যে রচনা। গদ্যের কিছু নমুনা এখানে তুলে দেয়া হল : :—

শাশুড়ী—ওগো বউ, তুই যে আজ চুপ করে বসে রয়েছিস! কাজ-কর্ম কি কিছু নাই?

বউ—যাগ্যে বাবু, (পোড়ার ঘরকন্না থাকলেই কি, না থাকলেই কি?

কর্ত্তা—কোথা গেলে? এসব সামিগ্র এনেছি, তোল না? এখন তুমিইত গেন্নি আর কে?

গিন্নি—(মানভরে) কার ঘর করবনি, কার কেঁথা পুড়লে বলবোও নি।

সমসাময়িক কালের আরেক জন নাট্যকারকে পাওয়া যায়। তাঁর নাম শেখ আজিমুদ্দীন। শেখ আজিমুদ্দীনের' কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে কবে প্রথম রচিত হয়, জানা যায়নি। তবে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় বলে প্রমানাদি মেলে। কড়ির মাথায়

www.pathagar.com

বুড়োর বিয়ে একখানা প্রহসন জাতীয় রচনা। গদ্যে-পদ্যে মিশ্র ভাষায় রচিত প্রহসনখানা একেবারে বিশেষত্বহীন। ভাষা, অলংকার, অভিনয়ের উপযোগী সব কিছু অনুপস্থিত।

শিমুয়েল পিরবক্স নামে জনৈক ভদ্রলোক 'বিধবা বিরহ নাটক' নামে একখানা সামাজিক নকশা জাতীয় নাটক রচনা করেন। নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। তবে পিরবক্স কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন তা জানা যায়নি। সম্ভবতঃ তিনি মুসলিম থেকে খৃষ্টান হন।

মুসলিম নাট্য আন্দোলনের অগ্রদূত মীর মোশাররফ হোসেন। নাট্য সাহিত্যে মুসলমানদের যে দীনতা প্রকাশ পাচ্ছিল, মীর মোশাররফ হোসেন তার অনেকটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে নানা প্রকার সামাজিক অসুবিধার জন্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাটক রচনায় এগিয়ে আসেননি। মীর মোশাররফ হোসেনের মধ্যে এ রকম একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু' নাটকীয় উপাদানে ভরপুর ছিল। উপন্যাস না লিখে বিষাদ সিন্ধুর বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করলেও তিনি সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন। তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুনর্জাগরণের জন্যে নাটক না লিখে তদানিন্তন সামাজিক ব্যবস্থা ও সমস্যাদির উপর বেশি জোর দেন। তিনি সমাজ কল্যাণমূলক নাটক রচনায় ব্যাপৃত হন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম সমাজে যে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল, তা দূরীভূত করতে তিনি চেষ্টা করেন। মীর মোশাররফ হোসেন মূলতঃ গদ্যশিল্পী, তবে তাঁর হাতে নাটকও সার্থকতা কম লাভ করেনি।

১৮৭৩ সালে প্রথম তাঁর 'বসন্তকুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

সংস্কৃত নাটকের রীতি-নীতি অনুসরণ করে তিনি বসন্তকুমারী রচনা করেন। বসন্তকুমারীতে যদিও কীর্তিবিলাসের ছাপ পরিলক্ষিত হয় তবুও বসন্ত কুমারীর একটি নিজস্বতা আছে। বসন্ত কুমারীর সংলাপে, চরিত্র সংযোজনে মোশাররফ হোসেন অনেকটা নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

মীর মোশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় নাটক 'জমিদার দর্পণ' ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। জমিদার দর্পণে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ' নাটকের ছাপ লক্ষণীয়। বিষয়বস্তুর সমধর্মিতা থাকলেও নীল দর্পণের সাথে জমিদার দর্পণের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। জমিদার দর্পণে তিনি পদ্যে সংলাপ রচনা করেছেন। নাটকে আবার গানও সংযোজন করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

মোশাররফ হোসেনর জমিদার পেরেস্তায় বহুদিন কাজ করেছিলেন। ফলে সেকালে জমিদারদের সম্পর্কে তাঁর বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি জমিদার দর্পণ রচনা করেন। সেকালে জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা রীতিমতো দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। তবুও মীর মোশাররফ হোসেন এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দেন। মীর মোশাররফ হোসেন কতকগুলি বাস্তব চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন। একদিকে সর্বহারা চাষী শ্রেণীর ফরিয়াদ, ইংরেজ আমলে জমিদার-দের যথেচ্ছচারিতা অপর দিকে বিচারের নামে বৃটিশ আমলে আইন আদালতে যে প্রহসন চলত; তার রূপ তিনি ফুটিতে তুলেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি দীনবন্ধুকে অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়া জমিদার দর্পণে কাহিনী, চরিত্র, সংলাপে প্রভৃতিতে বেশ দুর্বলতা দেখা যায়। নাটকের প্রধান বিষয় সেই কেন্দ্রিক জটিলতা ও দ্বন্দ্বের অভাব দেখা গিয়েছে।

www.pathagar.com

মীর মোশাররফ হোসেনের আরো দু'টি নাটক রয়েছে।' বেহুলা গীতাভিনয়' ১৮৮৯ সালে এবং 'এর উপায় কি' ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর উপায় কি একটি প্রহসন। কতকগুলি সামাজিক সমস্যা এখানে তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

মুহম্মদ আবদুল কাদের 'জগৎ মোহিনী' নামে একটি নাটক রচনা করেন।' নাটকটি পঞ্চাংক ছিল এবং ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। কাহিনীর বিন্যস্ত সঠিক হয়নি এবং চরিত্র স্ফুটনের ব্যাপারেও নাট্যকার সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ভাষার দিক দিয়েও নাটকটি কোন বিশেষ স্বাক্ষর বহন করে না। নাটকটিতে কাহিনীর যে জটিলতা জমে উঠেছে, তা চরিত্রগত নয়। বরং তা উপাখ্যানগত বলা যেতে পারে। জগৎ মোহিনীর কাহিনী পৌরাণিক রাজাদের কাহিনী। কিন্তু তাতে ঐতিহাসিক চরিত্র নেই, বরং কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র রয়েছে। জগৎ মোহিনী পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হওয়ায় এতে কোন সামাজিক চিত্র নেই।

মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনায় যখন মুসলিম বাংলা সাহিত্যাঙ্গন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সেই সময় আর একজন নাট্যকারের সাক্ষাত পাওয়া যায়। তাঁর নাম কাদের আলী। একখানা নাটক ছাড়া তাঁর আর কোন সাহিত্য সাধনার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'মোহিনী প্রেমপাশ, নামে তিনি একখানা নাটক রচনা করেছিলেন। ১৮৮০ সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটির কাহিনী হল একজন সুশ্রী স্ত্রী তার কুৎসিত স্বামীকে পছন্দ না করে অপর এক পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও মধ্য দিয়ে পরে পুর্নমিলন হয়। মোহিনী প্রেমপাশের কাহিনীতে জটিলতা ও

www.pathagar.com

দ্বন্দ্ব আছে। নাট্যকারের সমাজের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেখা যায়। সমকালীন সমাজের একটি বাস্তবরূপ তিনি তুলে ধরেছেন। সহজ ও সরল সংলাপের দ্বারা জীবনের জটিলতা ও নাটকের দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

নাট্য সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা নাট্য সাহিত্যে অগ্রগতির যে জোয়ার লক্ষ্য করা যায়, হঠাৎ তার অগ্রগতি রোধ করে দেয়া হয়। বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে এক আইন পাশ করে নাটকের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি রোধ করে দেয়। নাট্য সাহিত্যের উপর এই বিধি-নিষেধের ফলে নাট্য আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবে ব্যাহত হয়। তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলি নাটকের উপর এই ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য প্রতিবাদ জানায়। এই আইনে পুলিশের ওপর ক্ষমতা দেয়া হল যে, যদি পুলিশ নাটকের কোন স্থান আপত্তিকর মনে করে, তাহলে তারা তখনই সে নাটক বন্ধ করে দিতে পাবে। আইনের ফলে নাট্য সাহিত্যের স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়।

এর পরে আসেন নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম মূলতঃ কবি। কবিতার জন্যে তিনি খ্যাতি ও যশ লাভ করেছেন। তার নাটকে নতুনত্ব কিছু বয়ে আনে না। কবিতায় তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়েছেন, নাটকে তা অনুপস্থিত। তাঁর নাটকে জাতীয় জাগরণ, মুসলিম ঐতিহ্য দেশাত্মবোধ কিছুই নেই। এমনকি

www.pathagar.com

সমসাময়িক ঘটনাবলীও তাঁর নাটকে স্থান পায়নি। নাটকে শুধু তাঁর রোমান্টিক কবিমনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কিশোর বয়সে নজরুল ইসলাম যাত্রাদলের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি লেটো গানের দলকে গান লিখে দিতেন। লেটোর দলে যখন ছিলেন, তখন কয়েকটা গীতি নাট্যও তিনি রচনা করেন। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিজ্ঞতা এবং লেটোর প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। এই সময় নজরুল ইসলাম ঠগপুরের সঙ', 'চাষার সঙ', 'মেঘনাদ বধ', 'শকুনী বধ', 'দাতাকর্ণ,' 'রাজপুত্র', 'কবি-কালিদাস', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি। এদের মধ্যে 'চাষার সঙ'গীতি নাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নজরুল ইসলাম মানুষের জীবনের মানসিক দ্বন্দ্ব, জটিলতা তাঁর নাটকে স্থান করে নিয়েছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নজরুল ইসলাম মূলতঃ কবি। তাই সর্বত্র তাঁর রোমান্টিক মনের ছাপ সুস্পষ্ট। মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে নজরুল ইসলাম নাটকে প্রথম রূপক ব্যবহার করেছেন। রূপক ব্যবহার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে সংক্রামিত হয়েছে।

১৩১৪ বাংলা সালে 'নওরোজ' পত্রিকায় তাঁর ঝিলিমিলি প্রকাশিত হয়। ঝিলিমিলি ছিল একখানা গীতি নাট্য। ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, ভূতের ভয় ও শিল্পী, এই চারটি একাঙ্কিকা একত্রিত করে ১৯০৩ সালে ঝিলিমিলি পুস্তকাকারে বের হয়। ঝিলিমিলিতে মানবিক প্রেম এবং বিরহের কথা মুখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। নজরুল ইসলাম যৌবনের জয়গানের কবি ছিলেন। তাই ঝিলিমিলিতে নব যৌবনের আশা-উদ্দীপনার কথা পাওয়া যায়। সেতুবন্ধতে কবি প্রকৃতির

www.pathagar.com

গতি ও চঞ্চলতাকে সমর্থন জানিয়েছেন। নজরুল যখন ঝিলিমিলি রচনা করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই সঙ্গীন ছিল। রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বসে রচিত হওয়ায় 'ভূতের ভয়ে' এর ছাপ পড়েছে।

নজরুল ইসলামের 'আলেয়া' ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। আলেয়ার নাম প্রথমে তিনি মরু তৃষ্ণা রাখেন। পরে পরিবর্তন করে আলেয়া করেন। আলেয়া একটি গীতিনাট্য, এতে ৩০টি গান রয়েছে- আলেয়ার প্রতিটি চরিত্র যেন মানবতার এক-একটি প্রতিনিধি। এই চরিত্রগুলির মধ্যে চিরন্তন মানবসত্ত্বা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

নজরুল ইসলামের পরবর্তী নাটক মধুমালা। ১৩৩৭ বাংলা সনে এই গীতি নাট্যটি প্রকাশিত হয়। মদনকুমার মধুমালার যে একটি প্রাচীন রূপকথা আছে-তার উপর নির্ভর করে তিনি মধুমালা রচনা করেছেন। নজরুল ইসলামের গদ্যে যেমন তাঁর কবিতার আবেগ ও সংগীতময়তা দেখা যায়, গীতিনাট্য রচনা করতে গিয়ে তিনি এই আবেগধর্মিতা ত্যাগ করতে পারেননি। বরং কল্পনার প্রসার ও কবিতার আবেগ মধুমালার ভাষায় প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে আঙ্গিকের দিক দিয়ে শিথিলতা থাকলেও দেশপ্রেমের স্পর্শে মধুমালা প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। তবে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ ভাষণের মতো হয়ে গেছে।

'পুতুলের বিয়ে' নামে তিনি একটি শিশু নাটক রচনা করেন। নাটকটি শিশুদের জন্যে স্বার্থক রচনা এবং বেশ উপভোগ্য।

'বিদ্যাপতি' ও 'সাপুড়ে' নামে চলচ্চিত্রের জন্যে তিনি দু'টি কাহিনী রচনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বিদ্যাপতি এবং ১৯৪৯

www.pathagar.com

সালে সাপুড়ে চলচ্চিত্র রূপে মুক্তিলাভ করে। এ ছাড়া তিনি ভারতীয় রেডিওর জন্যে অসংখ্য গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। তাঁর সবগুলি এখনো প্রকাশিত হয়নি।

সকল মুসলিম নাট্যকার মুসলিম জাগরণ মূলক নাটক রচনা করেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতির উপর সকল-নাট্যকার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একমাত্র কবি নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। মুসলিম ঐতিহ্য ও শৌর্য বীর্য নিয়ে শাহাদত হোসেন নাটক রচনা করেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে তিনি নাটক রচনার সূত্রপাত করেন। নজরুল ইসলামের মতো শাহাদত হোসেনও মূলতঃ কবি। কিন্তু নাটকীয় দ্বন্দ্ব যেটা, সেটা তাঁর নাটকে বিদ্যমান। তবে তাঁর নাটকে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ অনুপস্থিত। তাঁর 'মসনদের মোহ' ঐতিহাসিক নাটক। তবে ইতিহাসকেও এখানে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়নি। অবশ্যি নাটক বা উপন্যাসে ইতিহাস পূর্ণভাবে অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। মসনদের মোহে রাজনৈতিক জটিলতা এবং সাংসারিক দ্বন্দ্ব দুটি জট পাকিয়ে উঠেছে। এমন একটি স্থান থেকে তিনি নাটক শুরু করেছেন, যা একটি জটিল সংকটের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি কৌশলে সে সংকট নিরসন করেছেন। সংকটের সম্মুখে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। কিন্তু সংকট মানব জীবনের স্থায়ী রূপ নয়। তাই সংকট কেটে গেলে আবার স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। এই নাটকে তিনি তেমনি একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। মানুষ নিজ সত্তার উপলব্ধি তখন করতে পারে, যখন কোন জটিলতা বা বিপর্যয়কে-সাহসের সাথে মোকাবেলা করে ওঠে। এ নাটকে তেমনি অনেকগুলি চিত্র তিনি উপহার দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মসনদের মোহ দু' অঙ্কের একটি ছোট নাটক। কোন চরিত্রে জীবন-রহস্য ও আত্ম উপলব্ধির অনুধাবনের চেষ্টা নেই। কতকগুলি ঘটনা পরম্পরায় এক-একটি চরিত্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এক-একটি চরিত্র আশাহীন, ভরসাহীন অনিশ্চিত জীবনের দিকে ধাবিত হয়েছে। সবার মধ্যে যে এক-একটা মর্ম্মন্তুত হাহাকার বিরাজিত, সংলাপ দীর্ঘ ও বিলম্বিত—এটা শুধু শাহাদত হোসেনের নাটকে দেখা যায় না, ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে এই ধরনের দীর্ঘ ও বিলম্বিত সংলাপের ব্যবহার বেশকিছু পূর্ব থেকে চলে আসছিল। সে কারণে শাহাদত হোসেনকে দোষী করলে চলবে না। শাহাদত হোসেনও গতানুগতিক প্রবাহে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

শাহাদত হোসেনের 'সরফরাজ খা'ও ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসকে তিনি অনুসরণ করেছেন শুধু কাহিনীর পটভূমিকা হিসেবে। ইতিহাসকে তিনি পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেননি অথবা কাহিনী পরিস্ফুটনের জন্যে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকেও মহিমা দান করেননি। সরফরাজ খার প্রাণশক্তি বা কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হল-কাহিনীর জটিলতায়। ইতিহাসের ঘটনার আবর্তনে নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। মোটকথা সরফরাজ খা নতুন আঙ্গিকে ও প্রকরনে ভাস্বর।

'আনারকলি' ঐতিহাসিক নাটক। তবে উপন্যাসের ছাঁচে গড়ে ওঠায় আনারকলির কাহিনীতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে ইতিহাসের আবেদন খর্ব হতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত আনারকলি প্রণয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়েছে। সামাজিক আবর্তন ও রাষ্ট্রিক কর্তব্যবোধে মানবীয় রূপ

www.pathagar.com

কল্পনা, কল্যাণকর কোন চিন্তা-ভাবনা কেমন করে ধূলাবলুন্ঠিত হয়, তারই সম্যক প্রকাশ আনারকলি।

শাহাদত হোসেনের পরে আসেন আকবর উদ্দীন। তিনি মুসলিম জাতীয় জাগরণ ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে মুসলিম ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে নাট্য রচনায় ব্যাপৃত হন। সমাজের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব ও সতর্ক থাকায় তিনি সামাজিক নাটকও রচনা করেন। তাঁর আজান সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচনা। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আজানের কাহিনী গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর নতুন আশা-উদ্দীপনা নিয়ে নতুন সমাজ গঠন করার প্রেরণা রয়েছে।

'সিন্ধু বিজয়' তার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। মোহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের কাহিনী নিয়ে সিন্ধু বিজয় রচিত। দাহিরের সাথে সংগ্রাম, দাহিরের কন্যাদের নিয়ে তার বদনাম—এই ঘটনা সিন্ধু বিজয়ের মূল কাহিনী। তারপর ক্রমে ক্রমে মোহাম্মদ বিন কাশিমের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তাই অতি দক্ষতার সাথে আকবর উদ্দীন ফুটিয়ে তুলেছেন। সিন্ধু বিজয়ে নাট্যকারের শিল্প-কুশলতার পরিচয় বহন করে। একটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে পরিণতি মর্মান্তিক করে তুলেছেন। নাটকের মূল বিষয় হল মুসলমান জাতি কত উদার, কত মহৎ, ধৈর্যশীল ও পক্ষপাতশূন্য। সমাজ ও জাতির জন্য আত্মবিসর্জন প্রভৃতি মানবীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠেছে। নাটকটি ছোট হওয়ায় অনেক চরিত্র গতি পায়নি এবং ফুটে উঠতে পারেনি।

www.pathagar.com

'নাদির শাহ' আকবরউদ্দীনের আর একখানা ঐতিহাসিক নাটক। নাদির শাহ নাটকে নাদির শাহের ইরানের সিংহাসনে আরোহণ ও ইরান সমাজের পরিবর্তনের চেষ্টা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া রাজ্য-লিপ্সু হয়ে নাদির শাহের ভারতবর্ষে আগমন, দিল্লী অধিকার, এখানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অতি নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও রাজ্যলিপ্সা নাটকের পটভূমি হওয়ায় এতে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ নেই। ফলে নাটক কোন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়নি। কোন নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও জটিলতা না থাকায় নাদির শাহ নাটক শুধু মাত্র প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

এদেশীয় একজন জমিদার ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যেকার এক সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মুজাহিদ' লিখিত। স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রিয়তার মাহাত্মকে অবলম্বন করে মুজাহিদ রচিত।

কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে যে নব জাগরণ আসে, ভারতীয় মুসলমানগন তাকে নিজেদের জাগরণ বলে ধরে নেন এবং তুরস্কের মুসলিম জাগরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে নব চেতনায় নাটক রচনা শুরু করেন। তুরস্কের নব জাগরণের আবেগ ও স্পন্দন বাংলা দেশের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও দেখা যায়। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইব্রাহীম খাঁ 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' রচনা করেন। এই দুই নাটকে মুসলিম জাগরণের ছবি রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। তুরস্কের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি দেশীয় সমস্যাবলীর কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সমাজের কোন জটিল সমস্যা, মানবতাবাদ প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব-কলহ,

www.pathagar.com

সামাজিক উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

'কাফেলা' নামে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ সামাজিক সমস্যামূলক একটি প্রহসন রচনা করেন। শ্লেষ ও ব্যাঙ্গের সাথে তিনি সমসাময়িক সামাজিক চিত্রগুলি তুলে ধরেন। সমাজের অশিক্ষা ও দুর্নীতি সম্বন্ধে যে তিনি শ্লেষাত্মক প্রহসন রচনা করেছেন, তাতে কিন্তু তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা নেই। সেটা স্থূল এবং হাস্যকর হয়ে পড়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যকারদের মধ্যে নুরুল মোমেন একজন শক্তিশালী নাট্যকার। তীক্ষ্ণ ও তীব্র চেতনাবোধ নাট্য রচনায় তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সমাজের প্রতি অত্যধিক সজাগ, অনুভূতি ও বেদনাবোধ তাঁকে নাটক রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। সুতীক্ষ্ণ সংলাপ, পটভূমি নির্বাচনে দক্ষতা, উপস্থাপনের কৌশল প্রকরণ ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব তাঁর নাটককে মহিমা দান করেছে। তাঁর 'নেমেসিস' ও 'রূপান্তর' পাকিস্তান সৃষ্টির আগে রচিত। নেমেসিস রচনায় তাঁর বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন এই নাটকটির মাধ্যমে। নেমেসিসের চরিত্র মাত্র একটি এবং ঘটনার প্রসারকাল মাত্র এক ঘন্টা। সমস্যা-সংকুল একটি জীবনের সকল পরিচয় ও সামাজিক সমস্যার কথা একটিমাত্র চরিত্রের মাধ্যমে একঘন্টা সময়ের মধ্যে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে তার থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেছে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই আত্মমুক্তির জন্য তার যে মর্মজ্বালা, সেটাকে তিনি দক্ষতার সাথে প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

রূপান্তরে ব্যাঙ্গ ও হাস্য-তামাসার মধ্যে সমাজকে আঘাত করেছেন। স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে আবার স্বামীর ঘরে পূর্ণ মর্যাদায় ফিরে আসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক জীবনের জটিলতার একটি আভাস দেয়া হয়েছে রূপান্তর নাটকে। তিনি হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে সমাজকে শাণিত আঘাত হেনেছেন।

'নয়া খান্দানে' লেখকের কাহিনী সংস্থাপন কৃতিত্বের দাবীদার নয়া খান্দানে হৃদয়বৃত্তির চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বেশি দিয়েছেন। অহনিকা মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় আনে, তার পরিচয় নয়া খান্দানে পাওয়া যায়। নয়া খান্দানে যে সমস্যাটি তিনি দেখিয়েছেন, তা প্রাচীন-কালীন নয় বা একটি সৃষ্ট কুসংস্কারও নয়—বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সৃষ্ট এ সমস্যা। নাটকের আঙ্গিক, প্রকরণ ও সংলাপে তিনি মেধার পরিচয় দিয়েছেন।

একটি হালকা বিষয়বস্তুর উপর 'আলোছায়া' রচিত। ক্ষণিকের একটি সমস্যা নিয়ে আলোছায়া রচিত। হাস্যরস সৃষ্টি এ নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। নাটক রচনার কতকগুলি বিশেষ গুণ আলোছায়ায় রক্ষিত না হওয়ায় আঙ্গিকের দিক দিয়ে নাটকটির কিছুটা হানি হয়েছে। আলোছায়ায় সর্বত্র একটি ব্যস্ততা লক্ষণীয়। এ ছাড়া 'যদি এমন হত' একটি দুর্বল কাহিনীর উপর গড়ে উঠেছে। তবে সংলাপে পূর্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নাট্যকারকে প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চের সাথে জড়িত থাকতে হয়। রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধে নিগূঢ় অভিজ্ঞতা না থাকলে স্বার্থক নাটক রচনা-করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ অভিনয়ে নাটকের সার্থকতা। অভি-নয় উপযোগী নাটক রচিত না হলে সে নাটক ব্যর্থ হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকায় তখন কোন রঙ্গমঞ্চ ছিল না। আবার সামাজিক কারণে পূর্ব থেকেই মুসলমানরা নাটক রচনার উৎসাহ বোধ করেনি। ফলে নতুন নাট্য রচনায় হাত দিয়ে তাদের ব্যর্থ হতে হয়েছে। অভিনয় ও মঞ্চের সাথে সম্পর্ক না থাকায় আবুল ফজলের চৌচির ও কায়েদে আজম শুধু সংলাপ-নির্ভর একটি কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আবুল ফজলের 'একটি সকাল' ও 'আলোকলতা' নাটিকা দু'টিও সংলাপ-নির্ভর হয়ে পড়েছে। তবে তাঁর ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিবেগ লক্ষণীয়। এদিক দিয়ে তিনি স্বার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

জসীমউদ্দীনের 'বেদের মেয়ে' ও 'পল্লীবধূ' পল্লী জীবন ভিত্তিক দু'টি নাটক। বেদের মেয়ের করুণ পরিণতিতে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লেখকের রচনা কৌশলে এই গীতিনাট্যটি সার্থকতা লাভ করেছে। পল্লীবধূ সংবেদনশীল হয়েছে।

মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ঐতিহাসিক নাটক। কায়কোবাদের মহাশ্মশান অবলম্বন করে রক্তাক্ত প্রান্তর লিখিত। ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও নিজস্ব একটি ভঙ্গিমায় রক্তাক্ত প্রান্তর ভাস্বর। ঐতিহাসিক নাটক হলেও মানবীয় প্রেম ও মানবতাবাদ এই দুটি জিনিস নাটকে ধ্বনিত। তার উপস্থাপনে, প্রকরণে ও সংলাপে রক্তাক্ত প্রান্তর একটি বিশেষ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রেমের আবেগকে তিনি নাটকের মূল বিষয় করে তুলছেন। নাটকের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সাধারণ নিয়তি ভাগ্যের শিকার হয়েছেন। সংলাপের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী

www.pathagar.com

সব চরিত্রগুলি দিয়ে ভাল ভাল বড় বড় কথা উচ্চারণ করেছেন। এখানে মনে হয় তার ব্যর্থতা।

মুনীর চৌধুরীর 'কবর' সামাজিক নাটক। কবর নাটকে তিনি কোন সার্বজনীন আবেদন জানাননি। ফলে নাটকটি স্থায়ীভাবে দর্শকের মনে রেখাপাত করে না। সমসাময়িক ঘটনার উপর রচিত সামাজিক সমস্যাই এখানে বেশী করে দেখান হয়েছে। সমসাময়িক ঘটনার উপর রচিত কাহিনী যে সার্বজনীন আবেদন বহন করে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। অথচ দর্শক মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে না।

ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' নাটকে একটি নিরীক্ষা চালান হয়েছে। এ নাটকে তিনি আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছেন।

আসকার ইবনে শাইখ জাতীয় জাগরণ, দেশাত্মবোধক ও সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। সমাজের প্রতি তার তীক্ষ্ণ চেতনাবোধ ও সমতাবোধ নাটকে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। তিনি পূর্ব পাকিস্থানের নাট্যকারদের মধ্যে অধিক সংখ্যক নাটক রচনার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থা সবই নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চান। মোটকথা পূর্ব পাকিস্তানের একটি সামগ্রিকরূপ প্রকাশে তিনি চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ' 'বিদ্রোহী পদ্মা' প্রধান। ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে তিতুমীর, অগ্নিগীরি ও রক্তপদ্মা নাটক রচনা করেন।

বিদ্রোহী পদ্মায় তিনি এক অত্যাচারী জমিদারের নির্মম অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে নাট্যকারের সৌন্দর্য ও

www.pathagar.com

প্রেম বোধ জেগে উঠেছে। উপস্থাপনা ও প্রকরণের দিক দিয়ে নাটকটি সার্থকতা অর্জনের দাবীদার। বিদ্রোহী পদ্মার কেন্দ্র বিন্দুতে। আবেগ ও প্রেম সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ চিরাচরিত ঘটনা। এখানেও নাট্যকার সেই পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন কিছু দান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দু'একটি চরিত্রকে যথেষ্ট শক্তিশালী ও জোরালো করা যেত। কিন্তু নাট্যকারের গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দেয়ায় আর সেটা সম্ভব হয়নি। নাটকটি এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে, জমিদারী প্রথা বিলোপের সাথে সাথে এর আবেদন হারিয়ে যেতে বাধ্য। সামাজিক নাটক ছাড়া ঐতিহাসিক নাট্য রচনায় আসকার ইব্‌নে শাইখ একই ভাবধারা অনুসরণ করেছেন। ফলে ঐতিহাসিক নাটক 'রক্তপদ্ম' একই রকম সংলাপ 'নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তপদ্মে প্রেমই যতটুকু জটিলতা ও দ্বন্দ এনেছে।

'তিতুমীর' নাটকে আসকার ইবনে শাইখ পাক-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গৌরবময় অধ্যায়কে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তিতুমীরের স্বাধীনতার প্রতি আমরণ সংগ্রাম 'এবং মৃত্যু' নাটকে বেদনাবোধের উদয়ের মাধ্যমে নাটকটির স্বার্থকতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। রক্তপদ্মে নাট্যকারের আবেগ ও উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ায় নাটকের সৌন্দর্য ও চরিত্র সৃষ্টিতে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। আসকার ইবনে শাইখের ভাষা আবেগবহুল ও স্বচ্ছন্দ। ফলে সংলাপে গীতিধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

শওকত ওসমান লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী। কথা সাহিত্যে সর্বত্র তিনি সমাজ-সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্য রচনায়ও এই

www.pathagar.com

সচেতনার স্বাক্ষর বহন করছে। কোন বিষয়ে বেশি সচেতনা যেমন শিল্পকর্মকে ব্যাহত করে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অত্যধিক সচেতনার ফলে নাট্য রচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে খর্ব করেছে। শওকত ওসমানের 'তস্কর ও লস্কর', 'আমলার মামলা' ও 'কাঁকর মণি' প্রধান নাট্যকর্ম। তিনি তাঁর নাটকে বর্তমান দুনিয়ার প্রধান যে সমস্যাটি অর্থাৎ আর্থিক সমস্যাটি বেশি করে তুলে ধরতে চেষ্টা চালিয়েছেন, এখানে তিনি শুধু সমস্যা সৃষ্টি করে এবং সমাজকে তা দেখিয়ে দিয়ে চুপ থাকেননি। একটি বিশেষ কোণ থেকে প্রত্যেকটি সমস্যার একটি সমাধান বের করারও চেষ্টা তিনি করেছেন। সমাজ-সচেতনার ফলে নাটকের বিষয়বস্তু একটি বিশেষ বক্তব্যে রূপায়িত হয়েছে। আর নাটকের চরিত্রগুল বিশেষ ছাঁচে গড়া এক শ্রেণীর সামাজিক জীব হয়ে পড়েছে। এদিক দিয়ে শিশুদের জন্য রচিত তার একটিম খানা নাটক সার্থকতা লাভ করেছে।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ উপন্যাস সাহিত্যের ন্যায় নাট্য সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। 'বহিপীর' তার সর্বজন-আদৃত নাটক। শওকত ওসমানের মতো সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহও সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়বস্তু নাটকের পটভূমি হিসেবে নিয়েছেন। বহিপীরে মানবতা ও হৃদয়বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করেছ। বহিপীরে উত্থাপিত সমস্যাটি আমাদের সমাজের একটি বহুদিনের সমস্যা। কিন্তু সচেতন কথাশিল্পী হওয়ায় নাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছে। যে সমস্যাটাকে তিনি উপস্থাপিত করতে গিয়েছেন, তাঁর তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। উপরন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রেম ও সৌন্দরের মধ্যে একত্রিভূত হয়ে গেছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে সচেতন কথা শিল্পীর সমস্যাই

www.pathagar.com

এখানে। তবে সংলাপ, আঙ্গিক, প্রকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালি-উল্লাহ্ যথেষ্ট কৃতিত্ব ও প্রশংসার দাবীদার।

আবদুল হকের 'অদ্বিতীয়া' সমাজের বহু বিয়ে সমস্যা নিয়ে রচিত। আবদুল হক তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন কথাশিল্পী। অদ্বিতীয় একটি বিশেষ আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে রচিত। তবে বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনায় মনোনিবেশ করায় চরিত্রগুলি স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। আর স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ না পাওয়ায় সেটা লেখকের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ প্রচার বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নাটক রচনা করতে গেলে চরিত্রগুলি তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। কোন বিশেষ স্বার্থ বা আদর্শ প্রকাশ করতে তৎপর না হলে প্রত্যেকটি চরিত্র মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠত। আর বিশেষ মনোভঙ্গী প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণতঃ দর্শককে পীড়া দিয়ে থাকে।

আজিমুদ্দীনের মহুয়া একই দোষে দুষ্ট। একটি বহুলপ্রচারিত বিখ্যাত লোক-কাহিনী নিয়ে নাটক রচনায় ব্যাপৃত হয়ে আজিমুদ্দীন দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। ফলে এখানেও চরিত্রগুলি স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরের নাট্যকারদের মধ্যে দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত : নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়াতে তার আদর্শ, সংস্কৃতি কি হবে তার প্রতিফলনের চেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক সমস্যাগুলিও নব্য লেখকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর এর সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা কি হবে, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

www.pathagar.com

ফলে এ জাতীয় সমস্যাটাও নবীন নাট্যকারদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। ফলে জাতীয় পুনর্গঠন ও সামাজিক সমস্যা আমাদের বিভাগোত্তর কালের নাটকের মধ্যে বিদ্যমান। এতে করে নাটকের বিষয়-বস্তু ও কাহিনীতে বৈচিত্র্য এসেছে। ওবায়দুল হকের 'চোরাকারবারের দিগ্বিজয়' ফররুখ শিয়রের 'ব্লাকমার্কেটিয়ব। আবদুল হাই মাশরেকি 'নতুন গাঁয়ের কাহিনী' কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াসের 'স্মাগলার', মীর নুরুল ইসলামের 'আড্ডা' প্রধান। এ ছাড়া প্রেম ও সামাজিক সমস্যা ঘটিক নাটক আবদুর রহীম আকন্দের 'কার ভুলে' একটি সফল নাটক। এ ছাড়া একই সময় ঐতিহাসিক নাটক ও রচিত এবং মঞ্চস্থ হয়েছে। এদের মধ্যে কবীর চৌধুরীর 'গণশত্রু', সৈয়দ আলী আহসানের 'ইডিপাস' ও আবদুল হকের 'গণশত্রু' প্রধান। এগুলি অনূদিত নাটক।

আঙ্গিকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে সিকান্দর আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান,' সাইদ আহমদের 'কারবালা', সৈয়দ আলী আহসানের কোরবানী, 'জোহরা' ও মুশতাবী এবং 'জুলায়খা নাটকে এই নাটকগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রচিত নাটকের অনুকরণে রচিত। আমাদের নাট্যকারগণ যে চুপ করে বসে নেই—জগতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তাঁরা সম্ভার এনে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার পূরণ করায় ব্যস্ত আছেন, সেই কথাই এখানে প্রকাশ পায়। বিশ্বের সব সাহিত্যে বর্তমান যুগে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার যে ঢেউ এখানে লাগবেনা তার কোন কথা নেই। স্বাভাবিক ও সংগীত কারণেই সে ঢেউ এখানে এসে আঘাত করেছে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া অসংখ্য বিদেশী ভাল ভাল জীবন নিরীক্ষামূলক নাটক বাংলায় অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে।

নাট্য সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার রঙ্গমঞ্চের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ঢাকা আমাদের সংস্কৃতি উন্নয়নের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতা ছিল বিভাগ-পূর্ব কালের সারা-ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমাদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে ঢাকা মুখী হয়। ঢাকায় রঙ্গমঞ্চ তো দূরে থাক, প্রায় ভাল কোন ছাপাখানাও ছিল না। শিল্পী সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য কোন প্রকাশকও ছিলেন না। নতুন সৃষ্ট রাষ্ট্রের অসংখ্য সমস্যার সাথে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নানারকম প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বেঁচে থাকতে হয়েছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ভাল রঙ্গমঞ্চ নাট্যশালার সাথে নাটকের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। একে অপরের সম্পূরক। ঢাকায় নাট্য-শালা তো দূরের কথা, কোন থিয়েটার পর্যন্ত ছিল না। নাটক হল দৃশ্য কাব্য। মঞ্চস্থের মাধ্যমে নাটকের সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু কোন রঙ্গমঞ্চ না থাকায় স্বাভাবিক এবং সংগতভাবেই এদেশের নাট্যকারগণ নিরাশ হয়ে পড়েন। নাট্য রচনায় তাঁরা কোন উৎসাহ বোধ করেন না। তাই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় নাট্য সাহিত্য পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

সত্যি কথা বলতে কি, বিভাগপূর্ব কালেও মুসলিম নাট্য ধারার বেগ ও গতি খুব জোরাল ছিল না। তখনকার নাট্যধারা একটি ক্ষীণ গতিধারায় বয়ে চলছিল। বিভাগোত্তর কালেও এ ধারার প্রবাহ সমানে চলতে থাকে। এর কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সুখের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যান্দোলন আজ আর পিছিয়ে নেই। স্বাধীনতার পর পরই নাট্যান্দোলনের ধারা ক্ষীণ হলেও সে স্বল্পকালের জন্য। স্বাধীনতা লাভের পর খুব শিগ্‌গীর আমাদের নাট্যকারগণ তৎপর হয়ে ওঠেন এবং নাট্য সাহিত্যে তাঁদের সংযোজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের নাটক এখন একটি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এগিয়ে চলছে। নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান আর পিছিয়ে নেই নির্দ্বিধায় আজ একথা বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com